

রাহে বেলায়াত

বিভাগ/অধ্যায়ঃ প্রথম অধ্যায় - বেলায়াত ও যিকর

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

ক. বেলায়াত ও ওলী

আরবী (الولاية، الولاية بكسرة الواو وفتحها) বিলায়াত, বেলায়াত বা ওয়ালায়াত অর্থ নৈকট্য, বন্ধুত্ব বা অভিভাবকত্ব (closeness, friendship, guardianship)। ‘বেলায়াত’ অর্জনকারীকে ‘ওলী’ বা ‘ওয়ালী’ (الولى) বলা হয়। ওলী অর্থ নিকটবর্তী, বন্ধু, সাহায্যকারী, অভিভাবক ইত্যাদি। বেলায়াত ধাতু থেকে নির্গত ‘ওলী’ অথেরই আরেকটি সুপরিচিত শব্দ ‘মাওলা’ (مولى)। ‘মাওলা’ অর্থও অভিভাবক, বন্ধু, সঙ্গী ইত্যাদি (master, protector, friend, companion)।

ইসলামী পরিভাষায় ‘বেলায়াত’ ‘ওলী’ ও ‘মাওলা’ শব্দের বিভিন্ন প্রকারের ব্যবহার রয়েছে। উত্তরাধিকার আইনের পরিভাষায় ও রাজনৈতিক পরিভাষায় এ সকল শব্দ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত। তবে বেলায়াত বা ওলী শব্দদ্বয় সর্বাধিক ব্যবহৃত (ولاية الله) ‘আল্লাহর বন্ধুত্ব’ ও (ولى الله) ‘আল্লাহর বন্ধু’ অর্থে। এই পুস্তকে আমরা ‘বেলায়াত’ বলতে এই অর্থই বুঝাচ্ছি।

আরবী ‘তরীক’, ‘তরীকাহ’ ব ‘তরিকত’ শব্দের অর্থ ‘রাস্তা বা পথ। ফার্সীতে এই অর্থে ‘রাহ’ শব্দটি ব্যবহৃত। আমরা এই পুস্তকে আল্লাহর বন্ধুত্ব লাভের পথ সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই।

ওলীদের পরিচয় প্রদান করে কুরআনে ইরশাদ করা হয়েছেঃ

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

“জেনে রাখ! নিশ্চয় আল্লাহর ওলীগণের কোনো ভয় নেই এবং তাঁরা চিন্তাগ্রস্ত হবেন না- যারা ঈমান এনেছেন এবং যারা আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করে চলেন বা তাকওয়ার পথ অনুসরণ করেন।”[1]

ঈমান অর্থ তাওহীদ ও রিসালাতের প্রতি বিশুদ্ধ, শিরক ও কুফর মুক্ত বিশ্বাস। “তাকওয়া” শব্দের অর্থ আত্মরক্ষা করা। যে কর্ম বা চিন্তা করলে মহান আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন সেই কর্ম বা চিন্তা বর্জনের নাম তাকওয়া। মূলত সকল হারাম, নিষিদ্ধ ও পাপ বর্জনকে তাকওয়া বলা হয়।

এখানে আমরা দেখছি যে, দুটি গুণের মধ্যে ওলীর পরিচয় সীমাবদ্ধ। ঈমান ও তাকওয়া। এই দু’টি গুণ যার মধ্যে যত বেশি ও যত পরিপূর্ণ হবে তিনি বেলায়াতের পথে তত বেশি অগ্রসর ও আল্লাহর তত বেশি ওলী বা প্রিয় বলে বিবেচিত হবেন।

এথেকে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রত্যেক মুসলিমই আল্লাহর ওলী। ইমান ও তাকওয়ার গুণ যার মধ্যে যত বেশি থাকবে তিনি তত বেশি ওলী। প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ ইমাম আবু জা'ফর তাহাবী (৩২১হি) ইমাম আবু হানীফা, মুহাম্মাদ, আবু ইউসূফ (রহঃ) ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা বা বিশ্বাস বর্ণনা করে বলেনঃ

المؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقران

“সকল মুমিন করুণাময় আল্লাহর ওলী। তাঁদের মধ্য থেকে যে যত বেশি আল্লাহর অনুগত ও কুরআনের অনুসরণকারী সে ততবেশি আল্লাহর নিকট সম্মানিত (ততবেশি বেলায়াতের অধিকারী)।[2]

রাসূলুল্লাহ (সা.) ওলীর বা বেলায়াতের পথের কর্মকে দুইভাগে ভাগ করেছেন: ফরয ও নফল। সকল ফরয পালনের পরে অনবরত নফল ইবাদত পালনের মাধ্যমে বান্দা বেলায়াত অর্জন করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ বলেছেনঃ

مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوْافِلِ حَتَّىٰ أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لِأَعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لِأُعِيذَنَّهُ

“যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলীর সাথে শত্রুতা করে আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার নৈকট্য অর্জন বা ওলী হওয়ার জন্য বান্দা যত কাজ করে তন্মধ্যে সবচেয়ে আমি বেশি ভালবাসি যে কাজ আমি ফরয করেছি। (ফরয কাজ পালন করাই আমার নৈকট্যে অর্জনের জন্য সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে প্রিয় কাজ)। এরপর বান্দা যখন সর্বদা নফল ইবাদত পালনের মাধ্যমে আমার বেলায়াতের পথে অগ্রসর হতে থাকে তখন আমি তাকে ভালবাসি। আর যখন আমি তাকে ভালবাসি তখন আমি তার শ্রবণযন্ত্রে পরিণত হই, যা দিয়ে সে শুনতে পায়, আমি তার দর্শনেন্দ্রিয় হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখতে পায়, আমি তার হাত হয়ে যাই, যদ্বারা সে ধরে বা আঘাত করে এবং আমি তার পা হয়ে যাই, যদ্বারা সে হাঁটে। সে যদি আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করে তাহলে আমি অবশ্যই তাকে তা প্রদান করি। সে যদি আমার কাছে আশ্রয় চায় তাহলে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় প্রদান করি।”[3]

তাহলে ওলী ও বেলায়াতের মানদণ্ড ঈমান ও তাকওয়া। আর ‘তিরিকতে বেলায়াত’ বা ‘রাহে বেলায়াত’ অর্থাৎ বেলায়াতের রাস্তা সকল ফরয কাজ আদায় এবং বেশি বেশি নফল ইবাদত করা। যদি কোনো মুসলিম পরিপূর্ণ সুন্নাত অনুসারে সঠিক ঈমান সংরক্ষণ করেন, সকল প্রকারের হারাম ও নিষেধ বর্জনের মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন করেন, তাঁর উপর ফরয যাবতীয় দায়িত্ব তিনি আদায় করেন এবং সর্বশেষে যথাসম্ভব বেশি বেশি নফল ইবাদত আদায় করেন তিনিই আল্লাহর ওলী বা প্রিয় মানুষ। এ পথে যিনি যতটুকু অগ্রসর হবেন তিনি ততটুকু আল্লাহর নৈকট্য বা বেলায়াত অর্জন করবেন।

আল্লাহর নিষেধ বর্জনে মূলত তাকওয়া বলা হয়। এজন্য বেলায়াতের পথে নফল মুস্তাহাব পালনের চেয়ে হারাম-মাকরুহ বর্জনের গুরুত্ব বেশি। এ বিষয়ে মুজাদ্দিদ-ই-আলফি সানী বলেন: আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য প্রদানকারী আমলসমূহ দুই প্রকার। প্রথম প্রকার ফরয কার্যসমূহ, দ্বিতীয় প্রকার নফল কার্যাবলী। নফল আমলসমূহের ফরযের সহিত কোনোই তুলনা হয় না। নামায, রোযা, যাকাত, যিকর, মোরাকাবা ইত্যাদি যে কোনো নফল ইবাদত হউক না কেন এবং তাহা খালেছ বা বিশুদ্ধভাবে প্রতিপালিত হউক না কেন, একটি ফরয ইবাদত তাহার সময়

মতো যদি সম্পাদিত হয়, তবে সহস্র বৎসরের উক্তরূপ নফল ইবাদত হইতে তাহা শ্রেষ্ঠতর। বরং ফরয ইবাদতের মধ্যে যে সুন্নাত, নফল ইত্যাদি আছে, অন্য নফলাদির তুলনায় উহারাও উক্ত প্রকার শ্রেষ্ঠতব রাখে। ... অতএব, মুস্তাহাবের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং মাকরুহ যদিও উহা ‘তানজিহী’ হয় তাহা হইতে বিরত থাকা যিকর মোরাকাবা ইত্যাদি হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, মাকরুহে তাহরীমির কথা কী আর বলিব ! অবশ্য উক্ত কার্যসমূহ (যিকর মোরাকাবা) যদি উক্ত আমলসমূহের (ফরয, মুস্তাহাব পালন ও সকল মাকরুহ বর্জনের) সহিত একত্রিত করা যায়, তবে তাহার উচ্চ-মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, অন্যথায় মেহনত বরবাদ।”[4]

এভাবে কুরআন-সুন্নাহের আলোকে আমরা দেখি যে, বেলায়াতের পথের কর্মগুলির পর্যায়, তথা মুমিন জীবনের সকল কর্মের গুরুত্ব ও পর্যায়গুলি নিম্নরূপঃ

প্রথমত, ঈমান : সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সবকিছুর মূল বিশুদ্ধ ঈমান। ঈমানের ক্ষেত্রে ত্রুটিসহ পরবর্তী সকল নেক কর্ম ও ধার্মিকতা পল্লশ্রম ও বাতুলতা মাত্র।

দ্বিতীয়ত, বৈধ উপার্জন : ঈমানের পরে সর্বপ্রথম দায়িত্ব বৈধভাবে উপার্জিত জীবিকার উপর নির্ভর করা। সুদ, ঘুষ, ফাঁকি,

খোঁকা, জুলুম ইত্যাদি সকল প্রকার উপার্জন অবৈধ। অবৈধ উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহকারীর ইবাদত আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় নয়।

তৃতীয়ত, বান্দার হক সংশ্লিষ্ট হারাম বর্জন : কর্মের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম ও সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফরয কর্ম। ফরয কর্ম দুই প্রকার: প্রথম প্রকার যা করা ফরয ও দ্বিতীয় প্রকার যা বর্জন করা ফরয, যা “হারাম” নামে অভিহিত। হারাম দুই প্রকার: এক প্রকার পৃথিবীর অন্যান্য মানুষ ও সৃষ্টির অধিকার বা পাওনা নষ্ট বা তাদের কোনো ক্ষতি করা বিষয়ক হারাম। এগুলি বর্জন করা সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ।

চতুর্থত, আল্লাহর অন্যান্য আদেশ নিষেধ বিষয়ক হারাম বর্জন।

পঞ্চমত, ফরয কর্মগুলি পালন।

ষষ্ঠত, মাকরুহ তাহরীমি বর্জন ও সুন্নাতে মু‘আক্কাদা কর্ম পালন।

সপ্তমত, মানুষ ও সৃষ্টির সেবা ও কল্যাণমূলক সুন্নাতে-নফল ইবাদত পালন।

অষ্টমত, ব্যক্তিগত সুন্নাতে-নফল ইবাদত পালন।

আমি এই বইয়ে কিছু ফরয-ওয়াজিব বিষয়ের আলোচনা করলেও, মূলত অষ্টম পর্যায়ের ইবাদতই এই বইয়ের মূল আলোচ্য বিষয়। উপরের সাতটি পর্যায়ের কর্ম যদি আমাদের জীবনে না থাকে তাহলে এই অষ্টম পর্যায়ের কর্ম অর্থহীন হতে পারে বা ভঙ্গামীতে পরিণত হতে পারে। আমরা অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সাথে লক্ষ্য করি যে,

আমাদের সমাজের ধার্মিক মানুষেরা প্রায়শ এই অষ্টম পর্যায়ের কাজগুলিকে অত্যন্ত বেশি গুরুত্ব দেন, অথচ পূর্ববর্তী বিষয়গুলির প্রকৃত গুরুত্ব আলোচনা বা অনুধাবনে ব্যর্থ হন। মহান রাসূল ‘আলামীন ও তাঁর প্রিয়তম রাসূল (সা.) যে কর্মের যতটুকু গুরুত্ব প্রদান করেছেন তাকে তার চেয়ে কম গুরুত্ব প্রদান করা যেমন কঠিন অপরাধ ও তাঁদের শিক্ষার বিরোধিতা, বেশি গুরুত্ব প্রদানও একই প্রকার অপরাধ।

এক্ষেত্রে আমরা কয়েক প্রকারের কঠিন ভুল ও অপরাধে লিপ্ত হচ্ছি :

প্রথমত, ফরয, ওয়াজিব বা সুন্নাত-নফল মু‘আক্কাদা ছেড়ে অন্যান্য সুন্নাত-নফলের গুরুত্ব দেওয়া। নফল ইবাদতের ফযীলত বলতে যেয়ে আমরা ফরযের কথা অবহেলা করে ফেলি। ফলে সমাজের অনেক ধার্মিক মানুষ অনেক ফরয ইবাদত বাদ দিয়ে নফলে লিপ্ত হন। যেমন, ফরয যাকাত না দিয়ে নফল দান, ফরয হজ্ব না করে নফল ইবাদত, ফরয ইলম অর্জন না করে নফল তাহাজ্জুদ, ফরয সংকাজে আদেশ প্রদান না করে নফল যিকর, ফরয স্ত্রী-সন্তান প্রতিপালন বাদ দিয়ে নফল ইবাদত ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত, হারাম বর্জন ও হালাল উপার্জন থেকে সুন্নাত-নফল পালনকে গুরুত্ব দেওয়া। ফরয পালনের চেয়ে হারাম বর্জন বেশি

গুরুত্বপূর্ণ, যদিও দুটিই একইভাবে ফরয। কিন্তু আমরা সুন্নাত ও নফল বা সপ্তম ও অষ্টম পর্যায়ের ইবাদতের গুরুত্ব বুঝাতে যেয়ে অনেক সময় উপরের বিষয়গুলি ভুলে যায়। ফলে অগণিত মানুষকে আমরা দেখি হারাম উপার্জন, হারাম কর্ম ইত্যাদিতে লিপ্ত রয়েছেন, অথচ বিভিন্ন সুন্নাত-নফল ইবাদত আগ্রহের সাথে পালন করছেন। বিশেষত, অনেকে বান্দার হক সংক্রান্ত হারামে লিপ্ত থেকে নফল ইবাদত পালন করছেন অতীব আগ্রহের সাথে।

তৃতীয়ত, নফল ইবাদতের ক্ষেত্রে সৃষ্টির সেবার চেয়ে ব্যক্তিগত সুন্নাত-নফলকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া। কুরআন ও হাদীসে মানুষের বা যে কোনো প্রাণীর উপকার করা, সাহায্য করা, সেবা করা, চিকিৎসা করা, কারো সাহায্যের উদ্দেশ্যে সামান্য একটু পথচলা, এমনকি শুধুমাত্র নিজেকে অন্য কারো ক্ষতি করা বা কষ্ট প্রদান থেকে বিরত রাখাকে অন্য সকল প্রকার সুন্নাত-নফল ইবাদতের চেয়ে অনেক বেশি সাওয়াব ও মর্যাদার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া আল্লাহর রহমত, বরকত, ক্ষমা ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সৃষ্টির সেবাকে সবচেয়ে বেশী ফলদায়ক বলে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, আমরা কুরআন ও হাদীসের এই স্পষ্টতম বিষয়টি একেবারেই অবহেলা করছি। একজন ধার্মিক মানুষ যিকর ওযীফাকে যতটুকু গুরুত্ব দেন মানুষের সাহায্য, উপকার বা সেবাকে সেই গুরুত্ব দেন না, বরং এগুলিকে ইবাদতই মনে করেন না।

চতুর্থত, অষ্টম পর্যায়ের কর্মসমূহের মধ্যেও পর্যায় রয়েছে। সাধারণত সে সকল কাজ রাসূলুল্লাহ (সা.) করেছেন বা করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন কিন্তু না করলে কোনো আপত্তি করেননি সেই কাজগুলিই অষ্টম পর্যায়ের। এই পর্যায়ের কাজের মধ্যে গুরুত্বের কম-বেশি হয় সুন্নাতের আলোকে। যে কাজ রাসূলুল্লাহ (সা.) সর্বদা করেছেন বা অধিকাংশ সময় করেছেন তবে না করলে আপত্তি করেননি তা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পক্ষান্তরে যা তিনি মাঝে মধ্যে করেছেন তার গুরুত্ব তার চেয়ে কম। অপরদিকে যা তিনি করেছেন ও করতে উৎসাহ দিয়েছেন তার গুরুত্ব যা

তিনি করেছেন কিন্তু করতে উৎসাহ দেননি তার চেয়ে বেশি।

আমরা এই পর্যায়ের কাজগুলিকেও উল্টাভাবে গ্রহণ করি। একটিমাত্র উদাহরণ দেব। রাসূলুল্লাহ (সা.) সর্বদা কম খাদ্য খাওয়ায় অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি কম খেতে, খুধার্ত থাকতে ও মানুষকে খাওয়াতে পছন্দ করতেন ও উৎসাহ দিতেন। এছাড়া তিনি খাওয়ার সময় দস্তুরখান ব্যবহার করতেন বলে জানা যায়। তবে সর্বদা তা ব্যবহার করতেন না বলেই বুঝা যায়। এছাড়া দস্তুরখান ব্যবহার করতে তিনি উৎসাহ প্রদান করেননি। সাহাবীগণ হেঁটে হেঁটে, দাঁড়িয়ে বা পাত্রে রেখেও খেয়েছেন। এখন আমরা দ্বিতীয় কর্মটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করি, অথচ প্রথম কাজটিকে গুরুত্ব প্রদান করি না।

এছাড়া অনেকেই এক্ষেত্রে সুন্নাতের অনুসরণ করতে যেয়ে সুন্নাতের বিরোধিতা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) যা মাঝে মাঝে করেছেন তা সর্বদা করলে তাঁর সুন্নাতের বিরোধিতা হয়। কারণ, তিনি মাঝে মাঝে অন্য যে কাজটি করতেন তা বর্জিত হয়। যেমন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকারের ও বিভিন্ন রঙের পোশাক পরতেন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য বিভিন্নভাবে গ্রহণ করতেন। কখনো পাগড়ি পরতেন, কখনো রুমাল পরতেন, কখনো শুধু টুপি পরতেন। কখনো জামা পরতেন, কখনো লুঙ্গি ও চাদর পরতেন... ইত্যাদি। এখন শুধুমাত্র এক প্রকারকে সর্বদা পালন করা তাঁর রীতির বিরুদ্ধতা করা।

পঞ্চমত, বেলায়াত ও তাকওয়ার ধারণার বিকৃতি। উপরের বিষয়গুলি আমাদের মনে এমনভাবে আসন গেড়ে বসেছে যে, প্রকৃত মুসলিমের ব্যক্তিত্ব, তাকওয়া, বেলায়েত ও বুজুর্গী সম্পর্কে আমাদের ধারণা একেবারেই উল্টো হয়ে গিয়েছে। আমরা পাগড়ি, টুপি, যিকর, দস্তুরখান ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন। কিন্তু ঈমান, বান্দার হক, হালাল উপার্জন, মানব সেবা সম্পর্কে উদাসীন। কেউ হয়ত গীবত, অহঙ্কার, বান্দার হক নষ্ট, হারাম উপার্জন ইত্যাদিতে লিপ্ত, কিন্তু টুপি, পাগড়ি, তাহাজ্জুদ, যিকর ইত্যাদি অষ্টম পর্যায়ের ইবাদতে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। আমরা এই ব্যক্তিকে মুত্তাকী পরহেয়গার বা ধার্মিক মুসলিম বলে মনে করি। এমনকি আল্লাহর ওলী বা পীর মাশায়েখ বলেও বিশ্বাস করি। অপর দিকে যদি কেউ মানব সেবা, সমাজ কল্যাণ ইত্যাদিতে লিপ্ত থাকেন তাকে আমরা আল্লাহর ওলী বলা তো দূরের কথা ধার্মিক বলেই মানতে রাজি হব না।

অনেক ধার্মিক মানুষ দস্তুরখান বা পাগড়ী নিয়ে অতি ব্যস্ত হলেও হালাল মালের খাদ্য ও পোশাক কি-না তা বিবেচনা করছেন না। লোকটির টুপি, পাগড়ি বা জামা কোন্ কাটিং এর তা খুব যত্ন সহকারে বিবেচনা করলেও তিনি বান্দার হক নষ্ট করছেন কিনা, ফরযসমূহ পালন করছেন কিনা, মানুষের ক্ষতি বা অকল্যাণ থেকে বিরত আছেন কিনা, কবীরা গোনাহগুলি থেকে বিরত আছেন কিনা ইত্যাদি বিষয় আমরা বিবেচনায় আনছি না।

ষষ্ঠত, আমরা সর্বশেষ পর্যায়ের নফল মুস্তাহাব কাজগুলিকে দলাদলি ও ভ্রাতৃত্বের মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করেছি। মূলত সকল মুমিন মুসলমান একে অপরকে ভালবাসবেন। বিশেষত যাঁদের মধ্যে প্রথম ছয়টি পর্যায় পাওয়া যায় তাঁদেরকে আমরা আল্লাহর ওলী ও মুত্তাকী বান্দা হিসাবে আল্লাহর ওয়াস্তে বিশেষভাবে ভালবাসব। নফল মুস্তাহাব বিষয় কম-বেশি যে যেভাবে পারেন করবেন। এ সকল বিষয়ে প্রতিযোগিতা হবে, কিন্তু দলাদলি হবে না। কিন্তু বাস্তব জীবনে আমরা দেখতে পাই যে, আমরা টুপি, জামা, পাগড়ি, দস্তুরখান ইত্যাদির আকৃতি, প্রকৃতি রঙ, যিকর, দু'আ, সালাত, সালাম ইত্যাদির পদ্ধতি ও প্রকরণ ইত্যাদিকেই দলাদলির ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করি। ফলে প্রথম

ছয়টি পর্যায় যার মধ্যে সঠিকভাবে বিরাজমান নেই, অথচ অষ্টম পর্যায়ে আমাদের সাথে মিল রাখেন তাকে আমরা আপন মনে করে দ্বীনি ভাই বা মহব্বতের ভাই বলে মনে করি। আর যার মধ্যে প্রথম ছয়টি পর্যায় বিরাজমান, অথচ অষ্টম পর্যায়ে আমার সাথে ভিন্নতা রয়েছে তাকে আমরা কাফির মুশরিকের মতো ঘৃণা করি বা বর্জন করি। এভাবে আমরা ইসলামের মূল মানদণ্ড উল্টে ফেলেছি। আমরা ইসলামের জামা উল্টে পরেছি।

ফুটনোট

- [1] সূরা ইউনুসঃ ৬২ ও ৬৩।
- [2] ইমাম তাহাবী, আল আকীদাহ (শারহ সহ), পৃঃ ৩৫৭-৩৬২।
- [3] সহীহ বুখারী, কিতাবুর রিকাক, নং ৬৫০২।
- [4] মাকতুবাৎ শরীফ ১/১ মাকতুব ২৯, পৃষ্ঠা ৫৭-৫৮।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=8721>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন